*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 96 - 103
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

# সুবোধ ঘোষের 'লঘু আরণ্যক' ও মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' : একটি তুলনামূলক আলোচনা

অভিজিৎ তিরকী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : abhijittirkey500@gmail.com

***Received Date*** *21. 09. 2024*
***Selection Date*** *17. 10. 2024*

***Keyword***
*Subodh Ghosh, Mahasweta Devi, Short story, Female character, Struggle.*

***Abstract***
*Subodh Ghosh's 'Laghu Aranyak' and Mahasweta Devi's 'Shikar' both reflect the story of two women. Mithi and Mary are oppressed by two socially dominant men. The characteristics of the two women's, the fightback is same even though it is different. They raised voice against this kind of patriarchal distortion. Mithi has tried to uproot the distortion by fighting silently in the quiet environment of the forest. She injured Prasad Babu. On the other hand, in the story 'Shikar', it is described how the people of higher class of the society see the women of the lower class as commodities. Mary also struggles for the social establishment of women. Prasad Babu and Tashildar have become one.*

## Discussion

সুবোধ ঘোষ ও মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের দুই কালজয়ী সাহিত্যিক। লেখালিখির কালবিচারের দিক থেকে সুবোধ ঘোষ মহাশ্বেতা দেবীর অগ্রজ লেখক। তাঁর জন্ম ১৯০৯ সালে। ১৯৪০ সালে 'অযান্ত্রিক' গল্পের মাধ্যমে তাঁর লেখালিখির সূত্রপাত। এরপর ১৯৮০ সাল অবধি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি রচনাকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর রচনার কালপর্ব মোটামুটি ১৯৪০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত। অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৯২৬ সালে এবং মৃত্যু ২০১৬ সালে। তাঁর লেখালিখির সূত্রপাত প্রায় চারের দশক থেকেই। প্রথম মুদ্রিত লেখা প্রকাশিত হয় খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় ১৯৩৯ সালে।[১] এর বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসীর রাণী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। আর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস হল ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'নটী'। এখান থেকেই প্রকৃত অর্থে তাঁর লেখালিখির শুরু। তবে মহাশ্বেতা দেবীর লেখালিখির কালপর্ব অপেক্ষাকৃত বেশি বিস্তৃত। সুবোধ ঘোষের প্রয়াণের পরে অর্থাৎ আটের দশক থেকে মহাশ্বেতা দেবীর লেখালেখি আরও অন্য মাত্রা পায়। দু-জনের লেখালিখির পরিসরও খানিকটা এক। সুবোধ ঘোষও তাঁর রচনায় অন্ত্যজ শ্রেণী, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনকেই তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবী যেন তাঁর লেখালিখির মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠেছেন। তাঁদের জন্য তিনি সর্বদা ভাবিত। লেখালেখিতে তার প্রতিফলন

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

লক্ষণীয়। আমরা সুবোধ ঘোষের 'লঘু আরণ্যক' ও মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের ভাবনার জগতকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করব।

সুবোধ ঘোষের 'লঘু আরণ্যক' আসলে আত্মরক্ষার গল্প, নারীর জীবনের লড়াইয়ের গল্প। গল্পটা এরকম, জমিদার প্রসাদবাবুর শিকারের প্রবল শখ। জঙ্গলের দানুয়া ভালুয়া ক্যাম্পে তাই তিনি আশ্রয় নেন তাঁর শিকারের বাসনাকে চরিতার্থ করবার জন্য। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করে মিঠি নামক এক ক্রিমিনাল ট্রাইব জাতের নারী। তার স্বামী মারা যাবার পর থেকে তাকেই প্রসাদবাবুর শিকারকর্মে খোঁজির কাজ করতে হয়। এই কাজে সে মাইনেও পায়, উপরন্তু বকশিশও জোটে। জঙ্গলে তিন বছরের শিশুসন্তানসহ তাকে পেটের দায়ে এই কাজে যুক্ত থাকতে হয়। প্রসাদবাবুর কামুক দৃষ্টিও তাকে বিদ্ধ করে চলে। অবশেষে বাঘিনী শিকারের লক্ষ্যে প্রসাদবাবু যখন মিঠির সঙ্গে মাচায় অবস্থানরত তখনই কামুকতায় আচ্ছন্ন হয়ে মিঠিকেই ভোগ করতে উদ্যত হন। মিঠি তখন আত্মরক্ষার তাগিদে প্রসাদবাবুকে উন্মত্ত বাঘিনীর মতো আক্রমণ করে।

এই আক্রমণ কিন্তু নিছকই হঠাৎ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; দীর্ঘদিন ধরে পীড়ন, লাঞ্ছনার অবশ্যম্ভাবী উদগিরণ মিঠির জীবনসংগ্রামের ইতিহাস লক্ষ করলে তা আরও স্পষ্ট হবে। স্বামী ভিখন মারা যাবার পর তিন বছরের সন্তানকে মানুষ করবার দ্বায় তাকেই নিতে হয়। স্বামীর জীবিকাকে বেছে নিতে হয় নির্দ্বিধায়। জঙ্গলের ভয়কে উপেক্ষা করেই সে কঠিন কাজে যুক্ত হয়, কেননা জঙ্গলের এই আশ্রয়েই তাকে বাস করতে হবে এই ভবিতব্য। ক্রিমিনাল ট্রাইব হওয়ার দরুন সামাজিকতা সে থেকে বিচ্ছিন্ন। এই পরিস্থিতিতে যখন ভিখন ও মিঠি প্রসাদবাবুর জমিদারির ভেতর বসবাসের আবেদন করেন, তখন প্রসাদের শারীরিক ভাবভঙ্গি লক্ষণীয়—

> "একবার ভিখনের দিকে, তারপর অনেকবার মিঠির দিকে তাকালেন প্রসাদবাবু। তারপর লাল চোখের নেশার রং একেবারে তরল করে দিয়ে বলেন—একটা ভালুকের সঙ্গে একটা হরিণী?"[২]

এই অনেকবার তাকানো ও পরখ করে তারপর তাদের আশ্রয় দেবার নেপথ্যে কোথাও যেন ভবিষ্যৎ ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রসাদবাবুর মনে আচ্ছন্ন ছিল। কারণ তিনি মনে করেন,

> "ঐ চেহারাতে জঙ্গলের যত কর্কশ স্নেহ দিয়ে পুষে রাখাই তো উচিত। নইলে বন্দী হয়ে পৃথিবীর কোন এক চিড়িয়াখানার গরাদের আড়ালে চলে যাবে।"[৩]

আসলে প্রসাদবাবু কোনোভাবেই মিঠিকে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। এর পেছনে কাজ করছিল প্রসাদবাবুর কামুক দুর্বুদ্ধি। মিঠির যৌবনরাগে তিনি লালায়িতপ্রায়। প্রসাদবাবু কামপ্রবৃত্তির প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে উপনীত। সুবোধ ঘোষ তাঁর এক প্রবন্ধে বলছেন—

> "কামবেগ বা যৌনপ্রবৃত্তির (Sexual Instinct) রীতিও ঐ ধরনের; তার চরিতার্থতার জন্য অবশ্য একটা আস্পদ দরকার, কিন্তু তার জন্য জাত-কুজাতের বিচার তো নেই-ই-সম বা বিষম কারণ শরীর, ইতর প্রাণী, জড় বস্তু অথবা নিজের দেহ, এর মধ্যে যে-কোন একটি তার রমণ-বিষয় (Sexual Object) হয়ে উঠতে পারে।...দৃষ্টিহ্লাদ (বা Scoptophilia) নামে একটা মানসিক তথা আচরণিক রোগ আছে। এই অস্বভাব আচরণকে দৃষ্টি রমণ (Voyer) বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, চোখে-দেখা রূপের পুলকাবেগ আপনাতেই নিঃশেষ নয়। এই পুলক কামপ্রবৃত্তির একটা দিক পরিপুষ্ট করে। কামপ্রবৃত্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় যৌনাসঙ্গে।"[৪]

প্রসাদবাবুর ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য। তিনি জমিদার, তাঁর এক সামাজিক আভিজাত্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কামের বশবর্তী হয়ে একজন ক্রিমিনাল ট্রাইব ভুক্ত মহিলার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব তাঁর অনিয়ন্ত্রিত কামুকতাকে নির্দেশিত করে। আপাতভাবে যাদের তাঁরা নিচু গোত্রের মনে করেন, তাদের প্রতিও এরূপ অনভিপ্রেত আচরণেও পিছুপা হন না। প্রসাদবাবু যখনই সুযোগ পান, নিজের কামোদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। আর জঙ্গলের সেই আদিম পরিবেশ যেন তাতে সহায়তা করে। প্রসাদবাবু লক্ষ করেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মিঠির কোমর ছুঁয়ে দুলছে কতগুলি বনযোয়ানের মঞ্জরী।...সেই মুহূর্তে অভিজ্ঞ চাকরও ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ব্যাগ থেকে একটা গেলাস বের করে আর হুইস্কি ঢেলে প্রসাদবাবুর হাতে ধরিয়ে দেয়। প্রসাদবাবুর চোখেও রঙ্গিন নেশা ধরে।"[৫]

এটা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যখন তিনি নিজেকে আর নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারেন না। ফলস্বরূপ মিঠির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি।

আসলে শিকারী প্রসাদবাবুর কাছে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার এবং মিঠি ও তার সন্তানের কোনও প্রভেদ নেই। তাই মিঠিকে তাঁর হরিণী বলে মনে হয় ও তার সন্তানকে মনে হয় খরগোশ। শিকার করে তাঁর যে পৈশাচিক আনন্দ অনুভূত হয়, সেই একই আনন্দ তিনি খোঁজেন নারী দেহের মধ্যে। ভাজা হাঁসের মাংস ও নারী-শরীরের স্বাদ তাঁর কাছে একই—

> "শিকারী প্রসাদবাবু যেন তাঁর দুই চোখে অদ্ভুত এক কৌতূহলের নেশা বিভোর করে দিয়ে হরিণীর মতো একটা শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখ ফেরান না প্রসাদবাবু। জঙ্গলের রাতজাগা জীবনে কোন সংহারের মুহূর্তে প্রসাদবাবুর চোখে এমন নিবিড় নেশা মত্ত হয়ে ওঠেনি। ভাজা হাঁসের মাংস খেতে কত ভাল লাগে, সেই স্বাদের মতো একটা স্বাদের জন্য শিকারী প্রসাদবাবুর বুকের নিঃশ্বাসের মধ্যে দুঃসহ একটা লোভের ঝড় তপ্ত হয়ে উঠেছে।"[৬]

এখানেই গল্পের চরম মুহূর্ত। একজন দক্ষ শিকারী নারীর শিকার হন। মিঠির চারিত্রিক পরিবর্তন এখানে লক্ষণীয়। হরিণী থেকে বাঘিনীতে উপনীত হওয়া দৃঢ় মানসিকতার পরিচায়ক। প্রাথমিক পর্বে মিঠি কিন্তু প্রসাদবাবুর বশেই ছিল। সেক্ষেত্রে জীবিকার তাগিদ, পেটের টান জড়িত ছিল। প্রসাদবাবু আর্থিক সাহায্যের বেড়াজালে যেন মিঠিকে কুক্ষিগত করে রাখতে চান। তাই জানোয়ারের খোঁজ পাওয়া না গেলেও তিনি মিঠিকে বকশিশ দিয়ে যান। শেষ সংহারের মুহূর্তেও মিঠির হাতে গুঁজে দেন দশ টাকার নোট। ভিখনের না থাকার উদ্বেগ প্রসাদবাবুর মনে নেই। এর কারণ যে শুধু মিঠি ভিখনের মতো পাকা খোঁজির কাজ পারে তা নয়; উদ্বেগ না থাকার একটা কারণ বোধহয় তাঁর ভোগকর্মে বাধাদানে আর কেউ রইল না। মিঠি স্বনির্ভরতা চেয়েছে। প্রসাদবাবুর মুখাপেক্ষী না থেকে নিজের জীবন-জীবিকা বেছে নিয়েছে। জাল আর ফাঁদ পেতে সে বাদুড় শিকার করে। বাজারে পাখিওয়ালাদের কাছে সেগুলো বিক্রি করে। এখন সে আর জন্তু জানোয়ারের ভয় পায় না, ভয় পায় মানুষকে; প্রসাদবাবুকে। কেননা, তিনি এলেই সন্তানকে রেখে তাকে যেতে হবে খোঁজের কাজে। মাতৃত্ববোধকে জলাঞ্জলি দিয়েই তাকে বেছে নিতে হয় কঠিন পথ। এই পথে সে এলেও আত্মসম্মান কোনোভাবেই বিকোতে রাজি নয়। স্বাবলম্বী মিঠি তাই আর বরদাস্ত করতে পারে না প্রসাদবাবুর অসভ্যতাকে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' গল্পটি 'নৈঋর্তে মেঘ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এই গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'শিকার'। গল্পের প্রথম প্রকাশ সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা যায় না। পরবর্তীতে গল্পটি 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন'-এ (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট) ১৯৯৩, ১৯৯৯ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়। তবে মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দশম খণ্ডের 'নিবেদন' অংশে সম্পাদক বলেছেন, 'এই খণ্ডে সংকলিত গল্প ও উপন্যাসগুলির প্রথম প্রকাশকাল ১৯৭০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে।' আবার 'নৈঋর্তে মেঘ' গল্পগ্রন্থটি ১৯৭৯ সালে সংকলিত। 'শিকার' গল্পটি ইংরেজিতে 'The Hunt' নামে অনূদিত হয়ে 'Imaginary Maps' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক।[৭]

কুরুডা গ্রামের মেরী ওঁরাও এর লড়াইকাহিনি এই গল্প। গল্পটি এরকম, কুরুডা গ্রামে সাহেবদের টিম্বার প্লান্টেশন যখন ছিল তখন থেকেই মেরীর মা ভিকনি সেখানে কাজ করত। ডিক্সনের ছেলে ১৯৫৯ সালে এসে বাড়ি, জঙ্গল সব বেচে দেবার আগে ভিকনির গর্ভে মেরীকে রেখে যায়। মেরী বড় হয়। এরপর যখন প্রসাদজী বাংলোয় থাকতে এলেন, তখন থেকেই মেরী প্রসাদজীর বাড়িতে কাজ পায়। তার ভালবাসার মানুষ মুসলিম যুবক জালিম। ওকেই বিয়ে করার কথা সে ভাবে। এরপর সেখানে গাছ কাটতে হাজির হয় ঠিকাদার তশীলদার সিং। তশীলদার সিং মেরীকে পাবার চেষ্টা চালাতে থাকে। উপরন্তু জবরদস্তিও করে। আশেপাশের ওঁরাও, মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষদের কম পয়সায় খাটিয়ে নেবার মতলব আঁটে। মেরী এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মেরীর বারংবার শাসানি সত্ত্বেও সে পিছু ছাড়তে নারাজ। অবশেষে আসে সেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাঙ্ক্ষিত সন্ধিক্ষণ। বারো বছর বাদে ওঁরাও মেয়েদের হোলির শিকারের দিন। মেরী সেদিন সবচেয়ে বড় জানোয়ার শিকার করে। তশীলদার সিং-কে মেরী হত্যা করে।

এই হত্যাকাহিনিরও পরম্পরাগত ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে ধরতে হলে প্রথমেই মেরীর জীবনকে দেখে নিতে হবে। মেরীর জীবনের দুই পর্যায়। তশীলদার সিং আসার পূর্বের জীবন ও তার পরবর্তী জীবন। লেখিকা মেরীর পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

> "বয়স আঠারো, দীর্ঘাঙ্গী, চ্যাপ্টা মুখ-নাক, রং তামাটে ফর্সা।...দূর থেকে ওকে খুব মোহনীয় দেখায় কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, ওর চোখের ভাষায় খুব কঠিন প্রত্যাখ্যান আছে।"[৮]

অনমনীয় ভাব তার চরিত্রে লক্ষ করা যায়। নিজের জীবিকা সম্পর্কে সচেতন। প্রসাদদের গাই, মোষ চরায়; তাদের বাগিচার ফল বাজারে খুব মুনাফার সাথে বিক্রি করে। নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানে বলেই সে দৃঢ়চিত্তে প্রত্যাখ্যান করে তাদের, যারা তার প্রণয়ী হতে চেয়েছে। কেননা, তার মায়ের মতোই তার পেটে বাচ্চা দিয়ে পালাবে না এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই অবিশ্বাসের জের তার ভালোবাসার মানুষটিরও প্রতি সে ফলাবার চেষ্টা করে। বিয়ে করবে বলেই জালিমকে সে বেছে নিয়েছে প্রণয়ী হিসেবে। এমনকি বিয়ের আগে জালিমের ঘরে যাবার কোনও আকাঙ্ক্ষা তার নেই। আর আর্থিক স্বাবলম্বী হলেই বিয়ে করবে তারা। আত্মসম্মানবোধ রয়েছে তার। সেখানে ঘা দিলেই সে দপ করে জ্বলে ওঠে। আসলে মেরী ওঁরাও সমগ্র আদিবাসী শ্রেণীর প্রতিনিধি। আর শোষণকারী তশীলদারদের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। যদিও ওঁরাও সমাজের কাছে তার গায়ের রং প্রতিরোধের দেওয়াল। ফর্সা হওয়ায় স্বজাতে তার জন্য ছেলে মেলেনি। তবুও ওর অন্তরে অন্তরে কোথাও যেন ওঁরাও সমাজের একজন হবার আকাঙ্ক্ষা আছে। মেরী তাই তশীলদারের খপ্পর থেকে যেমন নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, তেমনিই খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে রক্ষা করতে চায়। যখন তশীলদার গাঁওবুড়াদের হাতে চোলাইয়ের বোতল ধরিয়ে তাদের বশ করতে চায়; কম মজুরি দিয়ে নিজে লাভবান হতে চায়, মেরী তখন বলে—

> "বারো আনা আর আট আনা! এ পয়সায় তোহরি বা ছিপডোরে কোন কুলী বাবুদের ব্যাগ বয় না।"[৯]

তশীলদার তাই লাগাতার মেরীকে হাতে পাবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কারণ এর মধ্যেই সে দেখেছিল আগুনের স্ফুলিঙ্গ। গাছ কেটে ফিরে যাবার পূর্বে মেরীকে নিজের দখলে রাখলে যেমন সে অধিক লাভবান হবে, তেমনিই পরবর্তীতে যদি আবার এখানে আসতে হয় সেক্ষেত্রে তার কাজের সুবিধাই হবে। একদিকে যেমন মেরীকে ভোগ করার লক্ষ্য পূরণ হবে অন্যদিকে কম পয়সায় লোক খোঁজা আর দুর্লভ হবে না। মেরী তশীলদারের অভিসন্ধি বুঝতে পারে এবং পরিকল্পনামাফিক হোলির দিন নির্ধারণ করে তার সঙ্গে মিলনে সম্মত হয়। কেননা বারো বছর বাদে সেদিন মেয়েদের শিকারের দিন। লালসার বশবর্তী হয়ে তশীলদার দেখা করতে গেলে মেরী দা দিয়ে কুপিয়ে এক বীভৎস জানোয়ারের শিকার করে। এরপর অসামান্য তৃপ্তি সহযোগে গান করে আর নাচে—

> "হে হরমদেও
> এমন হোলি বছর বছর হোক
> এমন শিকার বছর বছর করি"[১০]

মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন- এই গল্পের কাহিনি বাস্তবসম্মত। তিনি যা দেখেছেন তা ব্যক্ত করেছেন গল্পে। নারীর এমন লড়াই সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে বলেছেন—

"ধরা যাক 'শিকার'। এলাকাটা আমি যেন দেখতে পাই, এতই চিনি। গল্পে যাকে মেরি ওঁরাও বলেছি, তাকে দেখেছি। বিহারেও আছে বাৎসরিক শিকার পরব। এ ছিল ন্যায় বিচার উৎসব। শিকারের পর সমাজপতিরা অপরাধীর বিচার করতেন, ওরা পুলিশের কাছে যেত না। সাঁওতালী ভাষায় এটা ল-বির। 'ল' মানে আইন, 'বির' মানে জঙ্গল। আর বিহারে, প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এটা 'জানী-পরব'। মেয়েদের শিকার উৎসব। ওই গল্পে বর্ণিত সকল ঘটনাই সত্য। সেদিন মেরি যা করে, ওখানে তা বার বার ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, স্ত্রী লোককে অমর্যাদা, অবমাননা করা বৃহত্তম অপরাধ। ধর্ষণ ওরা জানে না। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের সম্মান আছে। যখন লাপরা যেতাম, দেখতাম ফর্সা মেয়েটি দেহাতি ঢঙে (সামনে

আঁচল দিয়ে) হলদে শাড়ি পরে এক বিশাল মোষের পিঠে দিব্যি আরামে বসে আছে, আখ চিবোচ্ছে, কিংবা ভুট্টার খই। তোহরি বাজারে দেখেছি পান চিবোতে চিবোতে ফল ও শাকসবজীর দরাদরি করছে। বিড়িও খাচ্ছে, প্রচুর তর্ক করছে এবং জিতেও যাচ্ছে। কি ব্যক্তিত্ব! পরে জানলাম, পছন্দের মুসলিম ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্য জানীপরবের দিন ও কি করেছিল। গান শুনে শুনে ঘটনা জানলাম। আদিবাসীরা তো লেখে না, যখন যা ঘটে, তাই নিয়ে গান বাঁধে। যুদ্ধ, লড়াই, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ওরা গানে গানেই ধরে রাখে সকল স্মৃতি। এ সব সংগ্রহের কাজ কিছু চলছে। শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে আগুন পোহাতে পোহাতে ওর কাহিনী জানি। যে লোকটাকে মারে, একটা নেকড়েই বটে। আসল কথা গায়ত্রী, সেদিন ছিল জানীপরব। মেয়েদের শিকার উৎসব। সমগ্র আদিবাসী সমাজের চোখে যা পাপ, তার বিচার করে বাৎসরিক শিকার উৎসবের সত্য অর্থকে ও পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

১৮৫৫-৫৬ সালের মহান সাঁওতাল গণবিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আদিবাসী মেয়েদের ধর্ষণ করা। পাঠক বলেন, গল্পে আমি বড় বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি রক্তপাত ক্ষরণে। আমি মনে করি, যখন আদিবাসী বা অত্যাচারিত মানুষদের কথা বলছি, এ হিংসা সমর্থনযোগ্য। রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, হিংসা যুক্তিসহ, জনগণ যখন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়, রাষ্ট্রব্যবস্থা তো হিংসারই আশ্রয় নেয়। বলা হয়, ভারত রাষ্ট্র অহিংস। কিন্তু এ অহিংস দেশে প্রতি বছর কত গুলি চলে, ধর্মান্ধরা কত মৃত্যু ঘটায়? রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ব্যর্থ, তখন বিচারের জন্য ব্যক্তির হিংসা বা যে কোন উপায় গ্রহণের অধিকার আছে, ব্যক্তিমানুষ নীরবে যন্ত্রণা সয়ে যেতে পারে না। তহশীলদার মূলস্রোতের প্রতিনিধি। সে ঠিকাদার, তার পিছনে আছে সমগ্র প্রশাসনতন্ত্র, কেননা এই বেআইনী অরণ্যনিধন, যা ভারত জুড়ে চলছে, তা অতীব দক্ষতায় করা হয়। এবং সর্বদা অভিযুক্ত হয় আদিবাসীরা। একদা এক আদিবাসী আমাকে বলেছিল, গাছ কাটতে বলো, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা আমি কেটে দেব। মাথা কাটতে বলো, কেটে দেব। কেননা দিনান্তে পাঁচ টাকা আমার চাই।

তাহলে যে হাত গাছ কাটে, সে হাত ভারতে অরণ্যনিধনের জন্য দায়ী নয়। এতে বিশাল অঙ্কের টাকা জড়িত থাকে। দিল্লী, হায়দ্রাবাদ বা কলকাতার আসবাবপত্রই দেখ না। স্থানীয় রাজনৈতিক লোকজন, অঞ্চলের পুলিশ ও প্রশাসন ঘুস খায়। বেআইনী গাছের গুঁড়ি বহন করে রেলবিভাগ সহযোগিতা করে। বেআইনী কাঠ-চেরাই কল সর্বত্র গজিয়ে ওঠে। শহরবাসী বড় বড় মানুষরাই তো কর্ণাটকে চন্দন গাছ কাটার পিছনে আছে। সারা দুনিয়াতে সকল সরকার পরিবেশ-ভারসাম্য রক্ষা করছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। আজকের ভারতে যা সত্য, তেমনি সব ঘটনাই আমি মেরি ওঁরাও কাহিনী মাধ্যমে বলেছি। নিজেকে তো ভারতীয় লেখকই ভাবি, শুধু বাঙালী লেখক নয়।"[১১]

অর্থাৎ, শিকার গল্পের মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী একদিকে যেমন আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণের বিরোধিতা করেছেন, তেমনই অরণ্যনিধনে যে সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তি যুক্ত থাকে প্রশাসনের সম্মতিক্রমে এবং নিম্নবর্গের মানুষদের এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাও দেখিয়েছেন।

সুবোধ ঘোষ ও মহাশ্বেতা দেবী উভয়েরই গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নারী লালসার দিক। 'লঘু আরণ্যক' গল্পে প্রসাদবাবুর লালসা একটি অরণ্য পটভূমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যেখানে সামাজিকতার কোনও স্থান নেই। অন্যদিকে 'শিকার' গল্পে সামাজিকতার মধ্যে কীভাবে উঁচুস্তরের পয়সাওয়ালা মানুষ নিচুস্তরের নারীকে ভোগ্য হিসেবে দেখে, তা বর্ণিত হয়েছে। প্রসাদবাবু ও তশীলদার যেন এক হয়ে গেছে। নারীদেহের প্রতি দুজনেরই যে তীব্র আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই অনুমেয় তাঁদের আচার-আচরণে। প্রথম দর্শনে প্রসাদবাবুর মিঠির প্রতি অনেকবার তাকানো ও তশীলদারের দৃষ্টির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই— 'আরে বাব্বা! এ কি মেয়েছেলে? এই জঙ্গলে?'[১২]

উভয়ই নিজেদের অর্থসম্পদের ব্যবহার করে নারীদের বশে রাখবার জন্য। প্রসাদবাবু যেমন বকশিশ প্রদান করে, তেমনই তশীলদার বিভিন্ন উপঢৌকন সামগ্রীর সাহায্যে মেরীকে পেতে চায়। তবে প্রসাদবাবুর সঙ্গে তার পার্থক্য এখানেই, তশীলদার যেন একধাপ এগিয়ে। তার বিবেচনায় মেরী বস্তুসামগ্রী—

"তোর মতো মেয়ে মানুষ আমি দেখিনি। লাখ টাকার মাল তুই।"[১৩]

তশীলদারের ব্যবসায়ীসুলভ পণ্যগ্রাহী মানসিকতা এখানে লক্ষণীয়। আগেই বলা হয়েছে প্রসাদবাবুর যে কামপ্রবৃত্তির স্তর তা দৃষ্টিরমণ পর্যায় থেকে পুঞ্জিভূত হতে হতে একলাফে স্পর্শরমণ তথা যৌন আকাঙ্ক্ষার চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। তশীলদারের

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গতিপ্রকৃতি আরও তীক্ষ্ণ। বারবার মেরীকে কাছে পাবার চেষ্টা যেন তার স্পর্শরমণকাতরতার ইঙ্গিতবাহী। মেরীর হাত চেপে ধরা তারই দৃষ্টান্ত। এরপর সে মিলনের প্রস্তুতি নেয়। পুরুষতন্ত্রের চেনা রক্ত তাদের শিরায় প্রবাহিত, যা জানোয়ারের রক্তে বদলে যায় নিমেষে। তবে দুটি গল্পেই লেখকগণ নারী চরিত্রকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করেছেন। দুই নারীর বেঁচে থাকার লড়াই প্রাধান্য পেয়েছে; হোক না তা মিঠির ক্ষেত্রে সামাজিক গণ্ডির বাইরে। আত্মসচেতন দুজনেই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। মিঠি খোঁজির কাজ করে ও পাখি শিকার করে বিক্রিও করে। মেরীও প্রসাদদের গোরু চরায়, ফল বাজারে বিক্রি করে। মিঠিকে যেমন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়, মেরীও তেমনই লড়াই চালায় নারীর সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য; দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা শোষণের বিরুদ্ধে। মেরী সর্বদা নিজের মধ্যে আগুন পুষে রেখে চলে। সেই আগুনে রক্তাভ ঔজ্জ্বল্য আছে। নিভু নিভু ভাব তার নেই। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

> ১। ‘প্রণয়ী হতে চেয়েছে বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে দেখিয়েছে।’[১৪]
>
> মায়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে যে অবিশ্বাস জন্মেছে পুরুষদের প্রতি, সেই প্রেক্ষিতেই তার এমন আচরণ।
>
> ২। ‘চলতে চলতে একটি ধারাল দা ও ফস করে বের করল ও অলস কণ্ঠে বলল, তোমার মতো সরু প্যান্ট, কালো চশমা পরা ঠিকাদার তোহরির রাস্তায় টাকায় দশটা মেলে, তাদের আমি এই দা দেখাই।’[১৫]
>
> যখন তশীলদার সিং মেরীর কাছে আসবার চেষ্টা করে, তখন মেরী এমন দৃঢ়ভাবে জবাব দেয়।
>
> ৩। ‘পরে ওরকম বদমাশি নাখারা করতে এলে নাক কেটে দেব।’[১৬]
>
> ৪। ‘শহরের রাণ্ডী পেয়েছিস আমাকে। কাপড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিস?’[১৭]

তশীলদার কাপড় প্রদান করতে গেলে মেরী একথা বলে। প্রবল আত্মসম্মানবোধ তার। অন্যদিকে মিঠি বুকে শুকনো কাঠ নিয়ে চলে। সামাজিকতার গণ্ডির বাইরে এছাড়া তার অন্য উপায় নেই। কিন্তু যখন অসামাজিক, অরণ্য-আদিমতা তাকে ঘিরে ফেলতে চায় তখন তার শুকনো কাঠে ঘর্ষণ লাগে। দপ করে জ্বলে ওঠে দাবানল। মেরী কোনোভাবেই অন্যায়কে বরদাস্ত করতে রাজি নয়। কিন্তু মিঠি সহ্য করে যায়। তাইতো প্রসাদবাবু যখন মদ খেয়ে তার সংহারের নেশাকে জাগিয়ে তোলেন এবং মিঠির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকান, তখন তার কোনও প্রতিবাদ লক্ষিত হয় না। কিংবা প্রসাদবাবুর দেওয়া বকশিশকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

দুটি গল্পেরই শেষাংশ যদি লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ‘লঘু আরণ্যক’-এর ঘটনা খানিকটা ধীরগতিতে প্রবাহিত হতে হতে শেষ মুহূর্তে যেন অকস্মাৎ বিস্ফোরণ ঘটায়। আর ‘শিকার’ গল্পের মধ্যে যেন ভেতরে ভেতরে সুপ্ত বারুদ প্রচ্ছন্ন ছিল, যা অন্তিম লগ্নে এসে ভয়াবহ রূপ নেয়। মেরীর আগুনে চরিত্র সেই ভয়াবহতাকে প্রকট করে তোলে। পুরুষতন্ত্রের অপৌরুষতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে দুই চরিত্রই সেই শাসনতন্ত্রকে অস্বীকার করে। নস্যাৎ করে দেয় যাবতীয় সামাজিক অভিসন্ধি। নারীদের এমন অভ্যুত্থান সত্যিই দেখার মতো। দুটি গল্পেরই শেষে যেমন সংহারের কথা আছে, তেমনই পরবর্তী আলোকরেখার কথাও আছে। এই আলো নতুন জীবনের আলো, নতুন আকাঙ্ক্ষার আলো, আশার আলো, সামাজিক অন্ধকার দূর করবার আলো। ‘লঘু আরণ্যক’ গল্পের শেষে মিঠিও সেই আলোর দিকেই ধাবিত হয়—

> “মাচানের উপর থেকে আস্তে আস্তে ভোরের প্রথম আলোর আভাস দিতেই নেমে আসে মিঠি। গাছের গায়ে মুখ ঘষে মুখের রক্ত মুছে ফেলে। তারপর সেই ভুট্টার ক্ষেত মাড়িয়ে, নিমের আর খেজুরের ভিড় পার হয়ে, কে জানে এই অরণ্যের ভিতরে কোন শ্বাপদের গুহার ভিতরে নিরাপদে লুকিয়ে থাকবার জন্য চলে যায়। বুনো হরিণীর মতো এক নারী, তার কোলে খরগোসের মতো একটা ছেলে।”[১৮]

বিশেষভাবে লক্ষণীয় রক্ত মুছে ফেলার প্রসঙ্গ। যে রক্ত কিনা জানোয়ারের! এও দেখা যাচ্ছে যে, যে নারীকে কিছুক্ষণ পূর্বে বাঘিনীর মতো মনে হচ্ছিল তাকে পুনরায় হরিণীর মতো মনে হয়। সেই শান্ত রূপ। ছেলের সঙ্গে সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষায়

যেন কোনোভাবেই রক্তের দাগ না লাগে, এমনিই মাতৃত্ববোধ ফুটে ওঠে। ‘শিকার’ গল্পের শেষেও মেরী তার প্রেমিক জালিমকে সঙ্গে নিয়ে তারার আলোয় পথ হাঁটছে। এপ্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী এক সাক্ষাৎকারে বলছেন—

> “প্রশ্ন— আপনার এমন অনেক গল্প আছে যার শেষটি ব্যঞ্জনাবাহী, যেমন, ধরা যাক ‘শিকার’ গল্পটি। যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র মেরি ঠিকাদারকে হত্যা করে যখন তার প্রেমিক জালিমের কাছে চলে যাচ্ছে তখন অন্ধকার রাত্রি, তারার আলো। কিন্তু ঘটনাটি যেদিন ঘটছে সেদিন তো দোলপূর্ণিমার দিন, চন্দ্রালোকিত রাত। এটা নিয়ে যদি কিছু বলেন।
>
> উত্তর— (অনেকক্ষণ ভেবে) এটি প্রতীকী। আমি অনেক গল্পে এই রকম প্রতীক ব্যবহার করেছি।
>
> প্রশ্ন— মানে এই তারার আলো কী জীবনের অন্ধকার ভেদ করে নতুন দিনের আলোকরেখা কিংবা জীবনের আলোকে সূচিত করেছে?
>
> উত্তর— হ্যাঁ।”[১৯]

(মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পবিত্র কার্ফা, ১২/০৭/১৫)

সুতরাং আমাদের আলোচিত গল্পে লেখকরা দেখিয়েছেন একইসঙ্গে নারী নির্যাতন ও তার বিরুদ্ধে নারীদের গর্জে ওঠা। বর্তমান প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নারীদের এমন প্রতিবাদমুখর মানসিকতা প্রশংসনীয়। দিকে দিকে যেভাবে নারীদের নির্যাতিত হতে হয়, মুখ বুজে সহ্য করতে হয় সবকিছু; তার বিপরীতে এই লড়াই সম্মান আদায়ের, সমানাধিকার আদায়ের; সর্বোপরি মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার। নারী জাগরণের এমনিই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় এরকম প্রেক্ষাপট আরও রয়েছে যেখানে প্রতিবাদই একমাত্র হাতিয়ার।

**Reference:**

১. সরকার, নীলকমল, ‘অক্ষরেখা’, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৪২১
২. ঘোষ, সুবোধ, ‘সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ’, চতুর্থ খণ্ড, প্রাইমা পাবলিকেশনস, পৃ. ৩৩
৩. তদেব, পৃ. ৩৩
৪. বসু, নিতাই, ‘সুবোধ ঘোষ: প্রবন্ধাবলী’, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৪০৬/ জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২১০ - ২১২
৫. ঘোষ, সুবোধ, ‘সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ’, চতুর্থ খণ্ড, প্রাইমা পাবলিকেশনস, পৃ. ৩৪
৬. তদেব, পৃ. ৩৯
৭. গুপ্ত, অজয়, ‘মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র’, দশম খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০৩, মাঘ ১৪০৯, পৃ. ৫৬০-৫৬২
৮. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, দশম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৪৫
৯. তদেব, পৃ. ৫২
১০. তদেব, পৃ. ৫৯
১১. ঘোষ, নির্মল, ‘মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ’, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ১৯৯৮, পৃ. ১১৫-১১৬
১২. দেবী, মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, দশম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৫১
১৩. তদেব, পৃ. ৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ৪৬
১৫. তদেব, পৃ. ৫২

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 14*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

১৬. তদেব, পৃ. ৫২

১৭. তদেব, পৃ. ৫৩

১৮. ঘোষ, সুবোধ, 'সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ', চতুর্থ খণ্ড, প্রাইমা পাবলিকেশনস, পৃ. ৩৯-৪০

১৯. কার্ফা, পবিত্র, 'মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষ : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা', বাংলা বিভাগ (ভাষা ভবন), বিশ্বভারতী, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: VB-993 of 2006-07, পৃ. ২৯৯